লুপ্তজীবিকা

পুকুর জলের ডুবুরি ১৩
আলতা পরানো নাপতিনী ১৬
সাজো-ধোপা ১৯
কুয়োর ঘটি তোলা ২২
সিঁধেল চোর ২৫
আমি বহুরূপী ২৯
রামযাত্রা ৩২
কম্পাউন্ডারবাবু ৩৫
রানার ৩৮
হিং চাই, সুর্মা-হিং ৪১
ক্যাচার ৪৫
দাই-মা ৪৮
টোলের পণ্ডিত ৫১
অগ্রদানী ৫৪
দিল্লিকা কুতুব মিনার দেখো ৫৭
জঙ্গল-হাঁকোয়া ৬০
পুরাতন ভৃত্য ৬৩
পাংখাপুলার-হুঁকোবরদার ৬৭
পালকির বেহারা ৭০
সহিস, কোচোয়ান ৭৪
চাই-ই-ই চীনা সিঁদুর ৭৯
গ্রামের মেলার চিড়িয়াখানা ৮৩
বুড়ির মাথার পাকা চু-উ-ল ৮৬
গুমা, ভিক্ষে দাও ৮৯
তীর্থপাণ্ডা ৯৩
দুধ-মা ৯৬

লুপ্তকথা

১০১ আমসত্ত্ব, বড়ি
১০৪ কাসুন্দি
১০৭ নেমন্তন্ন বাড়ির মেনু বদল
১১০ কাগজ-কলম-কালি
১১৩ হারিয়ে যাওয়া 'ডাক'
১১৬ কত যে নতুন শব্দ
১১৯ গুড়, পাটালি
১২২ ঘটক-ঘটকি
১২৫ মশারি
১২৮ কাটা, পোঁতার গান
১৩২ মাছ, নতুন পুরোনো
১৩৫ ডিম
১৩৮ ও ঘুড়ি, তোমায় মনে পড়ে
১৪৪ চোদ্দ পিদিম, চোদ্দ শাক
১৪৮ গুলি
১৫২ 'ব্রহ্মাচূর্ণ'
১৫৮ লাঠি নিয়ে
১৬৪ কাঁকড়া, কচ্ছপ
১৭০ ওই যে আকাশ প্রদীপ
১৭৪ গরমের শরবত

পুকুর জলের ডুবুরি

পাঁচের দশকের শেষ, নয় তো ছয়ের দশকের গোড়ার কথা। বালির গোস্বামী পাড়ায় ঢ্যাঙাপুকুর ও আরেকটি পুকুর — ভট্টাচার্যদের শরিকানি পুকুর — লোক মুখে মুখে যা ভচ্চায্যি বা ভট্‌চায্যি পুকুর, যার মাঝখান নিয়ে মাটি ফেলে উঁচু রাস্তা। রাস্তার একপাশে জোড়া তালগাছ। তখনও দুই পুকুরের মাঝে মাটির রাস্তাটিতে কোনও আলো নেই। নতুন গরমে সেখানে চন্দ্রবোড়া, খরিশ মাঝে মাঝেই আড়াআড়ি শুয়ে থাকে, নয়তো যাওয়া-আসা করে। চৈত্রে পুকুরের ভাঙা ঘাটে হলুদ হলুদ নিমফল। ঘাটের পাশে জলের ভেতর তেল ছাড়ানোর জন্যে ভিজিয়ে রাখা কড়া, হাঁড়ি, বোখনো, চাটুতে ল্যাজে কালো ফুটকিওয়ালা পুঁটিমাছের ঝাঁক। রান্নার পর লেগে থাকা সর্ষের তেলের সন্ধানে। এমন চৈত্রদিনে ভট্‌চায্যি বাড়ির বৌয়ের গলার হার পুকুরে গড়িয়ে গেল। পুকুর ঘাটে গলায়, বুকে সাবান দেওয়ার সময় আলগা হয়ে ছিল 'এস'। তারপর টের পেতেই নিজে বুক অবধি জলে নেমে কত খোঁজাখুঁজি। জল ঘুলিয়ে দই। হারের আর পাত্তা নেই। তখন ডুবুরি ভরসা। মাথায় বড়জোর চার ফুট দশ। খুব কালচে চোখ। কালো রং। একমাথা চুল টেনে, উলটে পেছন দিকে আঁচড়ানো। কাঁধে একটা বড় ঝুড়ি। হাতে লোহার শিক। তখন গাজনের ঢাকের শব্দে শিমুল তুলোর ফল ফাটো ফাটো। সজনে ডাঁটা ফেটে গেছে কোথাও কোথাও। রোদ ভীষণ কড়া। সেই সময় ডুবুরি যাচ্ছিলেন গোস্বামী পাড়ার ওপর দিয়ে। নন্দেবাবুর

আলতা পরানো নাপতিনী

প্রতি বৃহস্পতিবার, একাদশী আর পূর্ণিমায় মা আলতা পরতেন। বাড়িতে আসতেন ছোটকাকিমা। মা বলতেন ছোটকাকিমা, তাই আমরাও বলতাম। কালো, লম্বা, দাঁত উঁচু। পরনে লালপাড় শাড়ি — এ শাড়ি শস্তায় পাওয়া যেত পুরোহিত-বামুনদের বাড়ি থেকে। গায়ে ব্লাউজ, পায়ে জুতো — কোনওটাই থাকত না। হাতের বটুয়ায় আলতার শিশি, পায়ের গোড়ালি মেজে দেওয়ার ছোট হালকা ঝামা, নখ কাটার নরুন। ছোটকাকিমার আর এক জা, সেজকাকিমাও আলতা পরাতেন। দুই জায়ে একটা চাপা রেষারেষি ছিল 'যজমান' ধরা নিয়ে। ছোটকাকা বাড়ি বাড়ি চুল কাটতেন। তখন ইটালিয়ান সেলুনে চুলের দর — চার আনা ছোটদের। বড়দের ছ' আনা। ক্লিপ দিয়ে মুড়িয়ে কেটে দেওয়া, ছেঁটে দেওয়া মাথার চুল। যাতে চার মাস অন্তত না ইঁটে বসতে হয়। এছাড়া বিয়েবাড়ি, পৈতেবাড়ি, মুখেভাত, চূড়াকরণ, শ্রাদ্ধ। ছোটকাকার রোজগার যা ছিল — তা দিয়ে বড় সংসার চলে না। বড়ছেলে হাবি সঙ্গে বেরত। ছোট সুনীল খালি গায়ে, আগরপাড়ার দড়িবাঁধা প্যান্ট পরে নানা লোকের ফাইফরমাশ খাটত। স্কুলে যেত না। সুনীলের পায়ে কোনওদিন জুতো দেখি নি।

তখন আলতা পরানোর রেট, একজোড়া পা, নতুন দশ পয়সা। পরে সাতের দশকের গোড়ায় তা বেড়ে চার আনা হয়েছিল। আমার মা অসম্ভব ফরশা ছিলেন। পুকুরঘাট থেকে স্নান করে ফেরার সময় তাঁকে দেখে প্রথম প্রথম স্থানীয় কোনও

সাজো-ধোপা

কলকাতা আর তার গা-লাগোয়া মফঃস্বলে ধোপা ছিল দু-রকমের — সাজো আর বাসি। সাজোরা এ বেলা কাপড় নিয়ে বিকেলেই কেচে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যেতেন। আর তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন ওড়িশার মানুষ। জাজপুর, কটক, বালেশ্বরের।

বাসি-ধোপারা মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করে কাপড় পৌঁছে দিতেন বাড়িতে। পুববাংলার ফরিদপুরে এই ধোপা-বাড়িতেই তৈরি হতো দেশি বিস্কুট, মায়ের কাছে শুনেছি। কলকাতার ধোপারা পাঁচের দশকেও অনেকে গাধা পুষতেন। চেতলা, কালীঘাট অঞ্চলে চোখে পড়ত ধোপার গাধা। পিঠে কাপড়ের ভারী বোঁচকা নিয়ে তারা হেঁটে চলেছে। কলকাতায় এখনও গাধা দেখা যাবে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে, সার্কাসরেঞ্জে। সেখানে এক জোড়া গাধা আর তাদের একটি বাচ্চা, বাঁধা থাকে রাস্তার ওপর। সাজো-ধোপার কাছে যেত বিছানার চাদর, সায়া, পাজামা। কখনও কখনও বালিশের ওয়াড়।

ধোপা যে পুকুরে কাপড় কাচে, তার জলে, পারিপার্শ্বিকে একটা আলাদা গন্ধ তৈরি হয়। সোডা, সাবান, নীল — সব মিশিয়ে জলের রঙ যায় বদলে। বড় বড় মাটির গামলায় নীল মেশানো জল, সাবান জল। যা দেখলে ঈশপের নীলবর্ণ শৃগালের গল্প মনে পড়ে যেতে পারে। সেই জলে গোটা আকাশ মেঘ আর রোদ নিয়ে ভেসে

আমসত্ত্ব, বড়ি

হিন্দিতে আমসত্ত্বকে বলে 'আমাওয়াট'। প্লাস্টিক কাগজে মোড়া যেসব চিনি-ক্যাটক্যাটে আমসত্ত্ব বাজারে পাওয়া যায় আর তা বাড়িতে এনে আমরা কিশমিশ-চিনি দিয়ে আমসত্ত্বের চাটনি বানাই, তা নাকি আসলে পেঁপে দিয়ে তৈরি, সঙ্গে সিনথেটিক রঙ আর গন্ধও থাকে তাতে মেশানো — এমন বলেন কুজনে। সে যাকগে, ছেলেবেলায় হজমিওয়ালার কাছে চুরন, হজমিগুলি, নুন-মশলা দেওয়া শুকনো বুনো কুলের সঙ্গে কালো রঙের আমসত্ত্ব নামের ছোট ছোট যে জিনিস খেতাম, তা নাকি ছিল আসলে 'তেঁতুলসত্ত্ব' — এমন শুনেছি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে আমসত্ত্বের কথা পাই। আর রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত সব লাইন — 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি/তাহাতে কদলি দলি/সন্দেশ মাখিয়া দি তাতে/হপুস হপুস শব্দ...' ইত্যাদি ইত্যাদি, আমাদের অনেকের জানা। আশির দশকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের পৌত্র সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সুভো ঠাকুর)-এর ৭ নম্বর জওহরলাল নেহরু রোডের ফ্ল্যাটে মুর্শিদাবাদের কোনও নবাব পরিবারের আত্মীয়ার পাঠানো বিচিত্র স্বাদের আমসত্ত্ব খাই। অনেকটা 'সর্পের খোল'-এর মতো রঙ ও চেহারার এই আমসত্ত্বের গায়ে সূক্ষ্ম নকশা ছিল, আর ভেতরে ছিল দানাওয়ালা চিনি, চিবিয়েই বুঝতে পারি। এমন

কাসুন্দি

কত কী ভেসে গেছে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন থেকে! আচার, আমসত্ত্ব, বড়ি, কাসুন্দি, খানিকটা পিঠে, পুলি, পায়েস। এখন সব কিনতে পাওয়া যায় দোকানে, এম্পোরিয়ামে, মেলায়। পায়েস ছাড়া সবই এখন রেডিমেড, কাচ-প্লাস্টিকের বোতল, নয় তো পলিপ্যাকে। অথচ বেশিদিন নয়, আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগেও মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির জীবনে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পরিবারে কাসন্দ বা কাসুন্দি তৈরি প্রায় নিয়মিত রুটিন ছিল। বৈশাখের মাঝামাঝি অক্ষয়তৃতীয়ার দিনটিতে পূর্ববঙ্গের ঢাকা-ফরিদপুরে পাছদুয়ারের পুকুরে বাড়ির মেয়ে-বউয়েরা স্নান সেরে শুদ্ধ কাপড়ে, নতুন গামছায় কালো সর্ষে ধুতেন। গামছায় আড়াই-তিন সের সর্ষে। সঙ্গে সামান্য হলুদ, তেজপাতা, জিরে, ধনে — বারো রকম মশলা। আম-কাসুন্দি হলে তার সঙ্গে কাঁচা, বোঁটাওয়ালা সবুজ আমও ধোয়া হতো। ফরিদপুরে তাকে বলত 'গিলা'।

মেয়েরা পুকুরের স্বচ্ছ জলে বার বার সর্ষে ধুয়ে পরিষ্কার করতে করতে খুব আবছা গলায় বলতেন, "চিনি চিনি, মধু মধু হইও। বারো বারো বছ্ছর থাইকো। হগ্গলের ভালো দেইখ্খো।" তাঁরা বার বার এসব কথাই বলতেন, সর্ষে ধুতেন।

ফরিদপুরে কাসুন্দি করা ও অন্যান্য অনুষঙ্গ নিয়ে ১৯৮৭-তে 'আবহমানের ছবি' বলে একটি গল্প লিখেছিলাম 'বিভাব'-এ। পুকুরঘাট থেকে নতুন গামছায় বাঁধা ধোয়া সর্ষে, মশলা, কাঁচা আম এনে অক্ষয়তৃতীয়ার রোদে গোবর ল্যাপা উঠোনে মেলে

নেমন্তন্ন বাড়ির মেনু বদল

পৌষ, চৈত্র, ভাদ্র আর আশ্বিন — এই চার মাস বাদ দিয়ে হিন্দু বাঙালির বিয়ে-থা বছরের বাকি দশ মাস। নেহাত গুপ্ত প্রেস, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বা পিএম বাগচি, বেণীমাধব শীল, মদন গুপ্তর পঞ্জিকায় যদি 'মল মাস' ঘোষণা না করে কোনও মাসকে, তাহ্‌লে এই দশ মাসের ভেতরই লগ্ন। জ্যৈষ্ঠ মাসে অনেক পরিবারের বড় ছেলের বা মেয়ের বিয়ে হয় না যদিও।

মুসলমান বাঙালির এসব কোনও ব্যাপার নেই। তাঁদের বিয়ে বারোমাসই। যদিও 'মোসলেম পঞ্জিকা' আছে — কিন্তু তা ধরে ধরে কে আর দেখেন বিয়ের দিনক্ষণ! হিন্দু বাঙালির বিয়ে, পৈতে (ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য হলে), সাধ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ (পৈতের আগে হতো, এখন প্রায় লুপ্ত), শ্রাদ্ধ, মুসলমান বাঙালির বিয়ে, আকিকা, মুসলমানি বা খত্‌না (সুন্নতও বলেন কেউ কেউ), কুলপড়া বা কুল খাওয়ানি (শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে লোক খাওয়ানো) সবেতেই খাওয়া-দাওয়া। ছয়ের দশকের গোড়াতেও হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্তের বাড়ি বিয়েতে ওড়িশাবাসী ঠাকুর। ভিয়েন বসিয়ে পানতুয়া, বোঁদে। সেই বোঁদে হাতে পাকিয়ে পাকিয়ে, মাথায় একটা কিশমিশ লাগিয়ে দিলেই দরবেশ। ভিয়েনের পানতুয়া অনেক সময়েই একটু শক্ত। কমলা ভোগও (হলুদ রঙের রসগোল্লা) তৈরি হতো বাড়িতে। বাবার কাছে শুনেছি ঢাকায় বাদাম তেলে ভাজা বড় বড় লুচি খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল বিয়েবাড়িতে, তিরিশের দশকে।